সমতার ইস্তেহার

ভূমিকা

২০১৯ সালে লোকসভা ভোটে বিজেপির উত্থান তথা তৎকালীন ফ্যাসিবাদী পরিস্থিতির মোকাবিলায় 'সমতার ইস্তাহার' বেরিয়েছিল। বিশ্বায়ন পরবর্তী সময়ে মেয়েদের, মুসলিমদের, এবং অন্যান্য নিম্নবর্গের সামান্য পরিমাণ অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত উন্নতির প্রেক্ষাপটে। বদলে যাওয়া পরিমণ্ডলে মানুষের ছোটোবেলার সুখস্মৃতিগুলির জাত এবং জাতি পরিচয় হয়ে মাথা তোলার প্রেক্ষাপটে। এখন ক্ষমতার রাজনীতির কিছু দল এবং সক্ষমতার রাজনীতির কন্ঠস্বরগুলিতে সমতার কথা শোনা যাচ্ছে সরাসরি বা 'সমতা' শব্দটা না উচ্চারণ করে। এই পরিস্থিতিতে 'সমতা' বলতে কী বোঝায়, সেটা আরেকটু স্পষ্ট করার চেষ্টা করা যাক।

এই পুস্তিকার আরেকটি উদ্দেশ্য হল, সমতার মাপকাঠিগুলিকে পুনর্মূল্যায়ন করা। গত পাঁচ বছরে নানা জনআন্দোলনের সরাসরি অভিজ্ঞতা ও সঙ্কটের বিস্তার উপলব্ধি করে উন্নয়ন ছাড়াও আরও দুটি মাপকাঠির প্রয়োজন হচ্ছে — নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা।

অসমানতাগুলির বারবার পুনর্জন্ম হয়। নিজেদের মধ্যেকার হিংসা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা ইত্যাদির বাস্তবায়নের মাধ্যমে। কিন্তু শুধু তা-ই নয়। গরম ঠান্ডা জল হাওয়া পরিবেশ ইত্যাদির মতো বাইরের জিনিসের প্রভাবেও।

এই পুস্তিকায় সার্বিক সমতার একটা সূচক-ও দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠকের কাছে বিনীত আবেদন — এই সূচক নিয়ে সমালোচনা বা মতামত দিন। একটি সার্বিক সমতার সূচকের ভিত্তিতে নানা পরিচয়ের মধ্যেকার অসমতা নির্ণয় করা গেলে তা জন-আন্দোলনগুলির দিশা-র কাজ করবে।

সমতা বনাম সাম্য/সমানতা

সমতা শব্দটিকে বেশিরভাগ সময়ই সমানতা-র সঙ্গে বা সাম্য-র সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হয়। সমতার ইংরেজি হল ইকুইটি। আর সমানতা বা সাম্য-র ইংরেজি হল ইকুয়ালিটি।

ফরাসী বিপ্লবের মূল তিনটি স্লোগান-এর একটি ছিল — ফরাসিতে ইগালিতে। যার ইংরেজি ইকুয়ালিটি। ফরাসী বিপ্লব পূর্ব রাজতন্ত্রে অভিজাত এবং যাজক সম্প্রদায় নানা সুবিধা ভোগ করত। জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে সুমন্ত্রণা পাওয়ার জন্য রাজা যখন সংসদ ডাকত, সেই সংসদে আলাদা করে অভিজাত এবং যাজক প্রতিনিধি থাকত, এবং তারা সংখ্যায়ও বেশি থাকত। ফরাসী রাজতন্ত্রের আইন কানুনেও অভিজাত এবং পুরোহিত সম্প্রদায়ের লোকেরা বিশেষ সুবিধা পেত। অর্থাৎ, আইনের চোখে সবাই সমান ছিল না। ফরাসী বিপ্লব সেই সমস্ত সুবিধা চূর্ণ করে এবং আইনের চোখে সবাই সমান — এটা প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৮৯ সালে রাজতন্ত্র-উত্তর প্রথম ক্ষমতা 'জাতীয় গঠনকারী সভা' (ইংরেজিতে ন্যাশনাল কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি) 'মানুষ ও নাগরিকদের অধিকারের ঘোষণা'-য় (ইংরেজিতে ডিক্লারেশন অফ রাইটস অফ ম্যান এন্ড অফ দ্য সিটিজেন) 'স্বাধীনতা, সম্পত্তি, নিরাপত্তা, এবং শোষণের প্রতিরোধ' কে মানুষের স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে বলা হয়। ফরাসী বিপ্লবের প্রথম কয়েক বছরে ধাপে ধাপে রাজনৈতিক ক্ষমতায় অভিজাত এবং যাজক দের অধিক প্রতিনিধিত্ব উঠে যায়; তারপর এদের আলাদা প্রতিনিধিত্ব-ও উঠে যায়। শেষমেশ ধনদৌলত ও শিক্ষাদীক্ষা ভিত্তিক অসমান ভোটাধিকার-ও উঠে যায়। সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের একটা করে ভোট চালু হয়, যদিও তা স্থায়ী হতে আরও পঞ্চাশ বছর লাগে।

অর্থাৎ, ফরাসী বিপ্লবের ইকুয়ালিটি বা সমানতা বা সাম্য হল — বিশেষ সুবিধা (ইংরেজিতে প্রিভিলেজ) থেকে 'সবাই সমান'-এ আসা।

ফরাসী বিপ্লব পরবর্তী ইউরোপ তথা সারা পৃথিবীতে এই ইকুয়ালিটি বা সাম্য বা সমানতা একটা ট্রান্সেন্ডেন্স বা উত্তরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়। চিন্তা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র চালনা — সব জায়গায় এই 'সবাই সমান' শব্দবন্ধ প্রাধান্য বিস্তার করে। ফরাসী বিপ্লব অনুপ্রাণিত নানা দেশের সংবিধানগুলিতে এর প্রতিফলন হয় — 'আইনের চোখে সবাই সমান'।

কিন্তু এই ট্রান্সেন্ডেন্স বা উত্তরণ -এ কীভাবে পৌঁছনো যায়? ফ্রান্স না হয় পৌঁছল বিপ্লব করে। অন্যান্য জায়গার কী হবে? এই নিয়ে নানা তর্ক বিতর্ক, নানা ধরনের বিপ্লব, গণতন্ত্রের নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছেই আজ প্রায় আড়াইশ' বছর ধরে।

আমাদের দেশের সমস্যাটি জটিল। এখানে স্বাধীনতার পরে ১৯৫০ সালে যে সংবিধান বানানো হয়েছে তাতে "সমানতার অধিকার" শিরোনামে (ইংরাজিতে রাইট টু ইকুয়ালিটি) লেখা হয়েছে — আইনের চোখে সবাই সমান (১৪ নং ধারা); ধর্ম, জাতি, জাত, লিঙ্গ, বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে ভেদাভেদ নিষিদ্ধ (১৫ নং ধারা); সরকারি চাকরিতে সবার সমান সুযোগ (১৬ নং ধারা); অস্পৃশ্যতা প্রথার বিলোপ এবং তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ (১৭ নং ধারা); মিলিটারি এবং শিক্ষাগত মর্যাদা বাদে আর কোনও মর্যাদাবাচক উপাধি রাষ্ট্র কোনও নাগরিককে দিতে পারবে না (১৮ নং ধারা)। যদিও, সামাজিকভাবে আমাদের বিশাল দেশে তখনও সবাই সমান নয়। সব মানুষ যে সমান নয়, তার পরোক্ষ স্বীকারোক্তি আছে ওই ১৫ নং ধারাতেই। বলা হয়েছিল, দোকান বা হোটেল থেকে শুরু করে কুয়ো বা রাস্তা ইত্যাদি — কোনও কিছু ব্যবহারেই উপরিউক্ত পরিচয়গুলির ভিত্তিতে বৈষম্য করা যাবে না। আবার ১৬ নং ধারাতেই বলা হয়েছিল, রাজ্য সরকারগুলি চাইলে স্থানীয় স্তরের সরকারি চাকরিগুলিতে ওই রাজ্যের বাসিন্দাদের জন্য সংরক্ষণ করতে পারে। এবং রাষ্ট্র চাইলে পিছিয়ে থাকা বর্গগুলিরর জন্য, রাষ্ট্রের মতে যারা সরকারি চাকরিতে পর্যাপ্তভাবে নেই (ইংরেজিতে নট অ্যাডেকোয়েটলি রিপ্রেজেন্টেড ইন দ্য সার্ভিসেস আন্ডার দ্য স্টেট), তাদের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। আবার ১৫ নং ধারাতে এটাও বলা আছে, মেয়েদের জন্য ও বাচ্চাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা যেতেই পারে।

আমাদের দেশে স্বাধীনতা-উত্তর সংবিধানে সমানতা বা সাম্যের কথা লেখা হয়ে গেছিল, কিন্তু তার জন্য দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি জায়গা ছাড়া আর কোথাও ব্যাপক সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন

হয়নি। ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল ব্রিটিশ উপনিবেশ-এর অবসানের জন্য। সেই ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের প্রেক্ষাপটেই সংবিধান রচিত হয়েছিল। ফলে আমাদের দেশে জাত, ধর্ম, গায়ের রঙ, জাতি, লিঙ্গ ইত্যাদি ভেদ-এ বৈষম্য রয়ে গেছিল ভীষণভাবে। স্বাধীনতা উত্তর সময়ে রামমনোহর লোহিয়ার নানা লেখায় পাওয়া যায় — জাতের ভিত্তিতে ভেদাভেদ সমাজে তো বটেই, উচ্চতম প্রশাসনিক স্তরেও রয়েছে জাঁকিয়ে। সংবিধানে অস্পৃশ্যতা প্রথার বিলোপ ঘটিয়ে সমানতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল রাজনৈতিকভাবে। কিন্তু জাত যে শুধু অস্পৃশ্যতা নয়, জন্মগত শ্রমবিভাজন এবং সামাজিক সম্পর্কের বদ্ধতা — তা সংবিধান প্রণেতাদের অন্যতম বাবাসাহেব আম্বেদকর থেকে শুরু করে উত্তর ভারতে সমতার রাজনীতির পুরোধা রামমনোহর লোহিয়া ইত্যাদিদের নানা লেখা ও বক্তৃতায় থাকলেও — সংবিধানে কোথাও জন্মগত শ্রমবিভাজন, সামাজিক সম্পর্কের বদ্ধতা (পংক্তিভোজন থেকে শুরু করে বিয়ে প্রভৃতি) ইত্যাদি বিলোপ করা হয়নি। সরকারি এবং সর্বজনীন পরিসরে পরিচয়ভিত্তিক বিদ্বেষ বিলোপ করা হলেও অসরকারি পরিসর ব্যবহারে পরিচয়ভিত্তিক ভেদাভেদ বিলোপ করা হয়নি। লোহিয়া চেষ্টা করেছিলেন আম্বেদকরকে সঙ্গে নিয়ে পরিচয়ভিত্তিক সমানতা বা সাম্যের লক্ষ্যে ব্যাপক সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলন করতে, কিন্তু আম্বেদকর সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই মারা যান (১৯৫৬)। লোহিয়া নিজেই সমাজবাদী দের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করেন, ক্ষমতার রাজনীতিতে শাসক কংগ্রেসের বিরোধী পরিসর-ও প্রসারিত করেন।

সংবিধানে পরিচয়ভিত্তিক সমানতা বা সাম্যের জন্য একটা পথরেখা বা দিশা দেওয়া হয়েছিল — যারা রাষ্ট্রের সরকারি চাকরিতে পর্যাপ্তভাবে নেই, তাদের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণ; মেয়েদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা; স্থানীয় মানুষদের জন্য চাকরিতে সংরক্ষণ। অর্থাৎ, আমাদের দেশে সমানতা বা সাম্যে উত্তরণের যে পথরেখা ওইমুখী আন্দোলনের বা বিপ্লবের অনুপস্থিতিতে সংবিধানে দেওয়া হয়েছিল — তা হল — পিছিয়ে থাকা সামাজিক বর্গগুলির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা। রাষ্ট্রীয় ভাবে বা 'উপর থেকে'। ফ্রান্সে যে সমানতায় উত্তরণ ছিল বিপ্লবোত্তর বাস্তব উত্তরণ, যেখানে বিপ্লবের মাধ্যমে বা 'নিচ থেকে' বিভিন্ন সামাজিক বর্গের বিশেষ সুবিধাগুলির বিলোপ হয়েছিল; আমাদের দেশে সেই সমানতায় উত্তরণ ছিল পূর্বঘোষণা, একটা ইউটোপিয়া বা কল্পনা, যা 'ওপর থেকে' বা রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্পন্ন হবে। এবং তা হবে পিছিয়ে থাকা বর্গগুলিকে বিশেষ

সুবিধা প্রদান করার মাধ্যমে। আম্বেদকর-রা সংবিধান লেখার সময় ভেবেছিলেন, দশ বছরের মধ্যে এই উত্তরণ ঘটে যাবে, এবং তখন আর এই বিশেষ সুবিধা প্রদানের প্রয়োজন থাকবে না।

স্বাধীনতার পর উত্তর ভারত জুড়ে জায়মান সমতার আন্দোলন দাবি করে, আমাদের দেশে অন্যান্য পিছিয়ে পড়া বর্গগুলিরও উচ্চশিক্ষা, সরকারি চাকরি এবং প্রশাসনে সংরক্ষণ প্রয়োজন। যেহেতু সংবিধানেই এই কথা বলা ছিল, তাই শাসক কংগ্রেস তা প্রাথমিকভাবে বিবেচনায় আনে। এই উদ্দেশ্যে পঞ্চাশের দশকে একটি কমিশন তৈরি করে ভারত সরকার — চেয়ারম্যান ছিলেন গান্ধীবাদী কাকা কালেলকর। কিন্তু তাতে লাভ কিছু হয়নি। ১৯৭৭ কেন্দ্রে প্রথম অকংগ্রেসি সরকার তৈরি হলে, সেই সরকার (মোরারজি দেশাই প্রধানমন্ত্রী) বিহারের তিনবারের সাংসদ ও তিরিশ দিনের মুখ্যমন্ত্রী, প্রাক্তন কংগ্রেসি ও পরে লোহিয়াপন্থী বিন্ধেশ্বরী প্রসাদ মন্ডল-এর নেতৃত্বে দ্বিতীয় 'পশ্চাদপদ বর্গগুলির কমিশন' বা 'মন্ডল কমিশন' তৈরি করে। সেই কমিশন ১৯৮০ সালে তার রিপোর্ট তৈরি করে কেন্দ্র সরকারকে জমা দেয়। কিন্তু ততদিনে কেন্দ্রে জনতা সরকারের পতন হয়েছে এবং কংগ্রেস সরকার (প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী) চলে এসেছে। ফলে মন্ডল কমিশনের রিপোর্টের প্রথম অংশ সংসদে পেশ হয় এবং তারপর রিপোর্ট ঠান্ডাঘরে চলে যায়। ১৯৮২ সালে তেষট্টি বছর বয়সে বিন্ধেশ্বরী প্রসাদ মন্ডল মারা যান। ১৯৯০ সালে ফের কেন্দ্রে অকংগ্রেসি সরকার (প্রধানমন্ত্রী ভি পি সিং) তৈরি হলে সেই সরকার মন্ডল কমিশনের পুরো রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনে ও লাগু করে। রিপোর্টে বিভিন্ন অপ্রত্যক্ষ হিসেব নিকেশের মাধ্যমে দেখানো হয়, ভারতে পশ্চাদপদ বর্গের জাতগুলির মধ্যে পড়ে ৫৪ শতাংশ মানুষ। তাদের জন্য ২৭ শতাংশ সরকারি চাকরি সংরক্ষণের সুপারিশ করে মন্ডল কমিশন। কমিশন বলে, ভারতে পশ্চাদপদ জাত কতগুলি এবং তাদের মোট জনসংখ্যা কত — তা যদি প্রত্যক্ষভাবে হিসেব করতে হয়, তাহলে প্রয়োজন জাতভিত্তিক জনগণনা, যা শেষবার হয়েছিল অবিভক্ত ভারতে, ব্রিটিশ আমলে, ১৯৩১ সালে। উল্লেখ্য, গান্ধীবাদী কাকা কালেলকরের নেতৃত্বাধীন প্রথম পশ্চাদপদ বর্গগুলির কমিশন-ও ১৯৫৫ সালে একই সুপারিশ করেছিল। মন্ডল কমিশনের রিপোর্টের শুরুতেই ছিল — "সমানদের মধ্যে সাম্য হয়। অসমানদের সমানভাবে দেখা আসলে অসমানতাকেই চিরস্থায়ী করে" (ইংরেজিতে, দেয়ার ইজ ইকুয়ালিটি অনলি অ্যামং ইকুয়ালস। টু ইকুয়েট আনইকুয়ালস ইজ টু

পারপিচুয়েট ইনইকুয়ালিটি)।

বলাই বাহুল্য, আমাদের দেশে সমতার আন্দোলন এবং রাজনীতি ইকুয়ালিটি বা সমানতা বা সাম্য-র একটি সমালোচনা তৈরি করেছিল। সেই সমালোচনাটি হল — না, সবাই সমান নয়। পশ্চিমেও ফরাসী বিপ্লবের সমানতার ভাষ্যের সাবভার্সন তৈরি হয়েছিল। ফরাসী বিপ্লব অনুপ্রাণিত বলশেভিক বিপ্লবোত্তর রাশিয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজের সমালোচনায় জর্জ অরওয়েল লিখেছিলেন, সবাই সমান, কিন্তু কিছু জন অন্যদের চেয়ে বেশি সমান। আমাদের দেশে সমানতার সমালোচনা অবশ্য শুধু সাবভার্সন ছিল না। বরং রাষ্ট্রীয় একটি নিদান (পিছিয়ে থাকাদের সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ) এবং পিছিয়ে থাকাদের নিয়ে সমতার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নতুন দিশার খোঁজ করেছিল।

ক) আমরা সমতা-কে কোনও উত্তরণ হিসেবে মনে করি না। উত্তরণ যদি কিছু হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তা ইকুয়ালিটি বা সমানতা — অর্থাৎ 'সবাই সমান' -এ পৌঁছনো। সমতার আন্দোলন বা নিশানা-কে সাম্য বা সমানতায় উত্তরণের পথ বলেও মনে করি না। আমরা মনে করি — সমানতা একটা ভালো আইডিয়াল, কোনও তুরীয় মুহূর্তে (যেমন, বিপ্লবের সময়) তা হয়ত অর্জিত-ও হয়। কিন্তু একবার তার তুরীয় বা বৈপ্লবিক অর্জন হয়ে গেলে তা যে চিরস্থায়ী হয় এমনটা নয়। ফলে 'সবাই সমান' বা সমানতা বা সাম্য — তা হল একটি তুরীয় ব্যাপার। অপরপক্ষে, সমতা হল একটি জাগতিক ব্যাপার। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে সমতার দিশা কাজ করবে সমাজে, একটা ইঞ্জিনের মতো।

খ) আমাদের সমতার আন্দোলনে মূলতঃ জাত (কাস্ট) ও জাতি (এথনিসিটি) পরিচয়ভিত্তিক সমতার প্রশ্নগুলিই গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। আমরা মনে করি, জাত এবং জাতির সঙ্গে লিঙ্গ থেকে শুরু করে আরও যত ধরনের পরিচয় আমাদের দেশের মানুষের হয় বা হতে পারে, সমস্ত কিছুর ভিত্তিতে সমতার প্রশ্নটি তোলা প্রয়োজন এবং প্রতিটিই সমান গুরুত্বের।

গ) সমতা শুধু সামাজিক ব্যাপার নয়, বরং বেশিটাই রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় স্তরের হস্তক্ষেপ সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে সমতার আন্দোলন যেমন প্রতিটি পরিচয়ভিত্তিক আন্দোলনের দিশা দিয়ে গঠিত; একইসাথে তা রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের অপেক্ষায়-ও থাকে। ফলে সমতা যেমন 'নিচের থেকে', তেমনই 'উপর থেকে'-ও।

সমতার সূচক

সমতার একটা সার্বিক সূচক তৈরির চেষ্টা করব আমরা। প্রশাসনিক স্তরে ও গবেষণায় আংশিক সমতার সূচক বানানো হয়ে থাকে। যেমন, মন্ডল কমিশন একটা জাত বা বর্গভিত্তিক অসমতার সূচক তৈরি করেছিল। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবোন্নয়ন রিপোর্ট লিঙ্গ অসমতার সূচক তৈরি করে।

২০১০-১১ থেকে চালু হওয়া রাষ্ট্রপুঞ্জর এই সূচকে মেয়েদের তিনটে মূল সূচক রাখা হয় — স্বাস্থ্য, ক্ষমতায়ন, এবং শ্রমবাজারে অন্তর্ভুক্তি। স্বাস্থ্য-র মধ্যে পড়ে মাতৃত্বকালীন মৃত্যু, এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মা হওয়া। ক্ষমতায়নের মধ্যে পড়ে হাইস্কুল বা কলেজে পড়া, এবং দেশের সংসদে কত অংশ আসনে মেয়েরা আছে। শ্রমবাজারে অন্তর্ভুক্তি মানে কত শতাংশ মহিলা কাজ করতে চায়। মাতৃত্বকালীন মৃত্যু ও অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় মা হওয়ার অংশ দুটি পরস্পরের সাথে গুণ করে তৈরি হয় স্বাস্থ্য সূচক — যা শুধু মেয়েদের জন্য করা হয়। একইভাবে হাইস্কুল বা কলেজে পড়া এবং দেশের সংসদে মেয়েদের অংশভাগ গুণ করে তৈরি হয় মেয়েদের ক্ষমতায়নের সূচক। এটা ছেলেদেরও করা হয়। শ্রমবাজারে অন্তর্ভুক্তি সূচক-ও ছেলেদের জন্যও করা হয়। এবার মেয়েদের সূচকগুলির অনন্যক-এর গড় করে তার আবার অনন্যক বার করা হয়। এইভাবে বিপরীত গড় বা হারমোনিক মিন-এর মধ্যে দিয়ে তিনটির মধ্যে একটি বা দুটি সূচক যদি খুব বড়ো-ও হয়, তার জন্য সামগ্রিক গড় যাতে বেড়ে না যায় তার ব্যবস্থা করা হয়। আরও ভালো করে বললে, এই বিপরীত গড়-এর মাধ্যমে সূচকগুলির মধ্যে যে সূচকটি সবচেয়ে ছোট, তার কাছাকাছিই যাতে সামগ্রিক লিঙ্গগত সূচকটি থাকে তা নিশ্চিত করা হয় — পশ্চাতে রাখিছ যে সূচক-কে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে। এবার একটা রেফারেন্স সূচক তৈরি করা হয়,

সূচকগুলির মধ্যে ছেলে ও মেয়েদের গড় সূচক তৈরি করে এবং তারপর তিনটি গড় সূচককে গুণ করে। ছেলেদের ক্ষেত্রে মাতৃত্বগত স্বাস্থ্য সূচক নেই, তাই একের অর্ধেক ধরা হয় ছেলেদের স্বাস্থ্য সূচক। শেষে লিঙ্গগত বিপরীত গড় সূচক ও রেফারেন্স সূচক এর অনুপাত-কে লিঙ্গগত সূচক হিসেবে ধরা হয় এবং তাদের অনুপাত-কে নেওয়া হয় আসল 'লিঙ্গ অসমতা সূচক' হিসেবে। কখনও যদি কোনও অংশভাগ শূণ্য হয়, তা দূর করার জন্য একটা ন্যুনতম অংশভাগ নেওয়া হয়। মাতৃত্বকালীন মৃত্যুর ক্ষেত্রে দেশে প্রতি লক্ষ মা পিছু একটি ন্যুনতম সংখ্যা ও একটি সর্বোচ্চ সংখ্যা ধরা হয়; ন্যুনতম মানে হল, স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি করে এর নিচে নামা সম্ভব নয়; সর্বোচ্চ মানে হল, এর বেশি হলে দেশটায় কোনও মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যব্যবস্থা নেই।

মন্ডল কমিশনের রিপোর্টে নির্দিষ্ট সূচক ঠিক করা হয়েছিল যার ভিত্তিতে কোনও বর্গ/জাতকে পশ্চাদপদ বলা যায়। কমিশন চারটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গেছিল। এক) অন্যান্য রাজ্য সরকারগুলিকে জিজ্ঞাসা করা, কোন কোন জাত বা বর্গকে তারা পিছিয়ে থাকা বলে মনে করে, কেন, এবং তাদের জনসংখ্যা কত। দুই) কেন্দ্রীয় সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও তার অধীনস্থ বিভাগগুলিকে জিজ্ঞেস করা, কতজন কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরে এসসি এবং এসটি বাদে অন্যান্য পিছিয়ে থাকা বর্গের (কিছু সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানদন্ড-র ভিত্তিতে)। তিন) কমিশন বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছে প্রশ্ন রেখেছিল। চার) কমিশন নিজে সামাজিক ও শিক্ষাগত সমীক্ষা চালিয়েছিল।

এগুলির মধ্যে দিয়ে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বিচার বিশ্লেষণ করে কমিশন পশ্চাদপদতার এগারোটি মাপকাঠি তৈরি করে এবং সেগুলিকে তিনটি বৃহত্তর মাপকাঠি-বর্গের মধ্যে ঢোকানো হয় — সামাজিক, শিক্ষাগত, এবং অর্থনৈতিক। এক) সামাজিকের মধ্যে পড়ে — যে সমস্ত জাত/বর্গ-কে অন্যরা পশ্চাদপদ বলে মনে করে, যে সমস্ত জাত/বর্গ জীবনধারনের জন্য মূলতঃ কায়িক শ্রমের ওপর নির্ভরশীল, যে সমস্ত জাত/বর্গের মেয়েদের ও ছেলেদের ১৭ বছরের কম বয়সে বিয়ে হওয়ার হার রাজ্যগত গড়-এর চেয়ে গ্রামে যথাক্রমে ২৫ ও ১০ শতাংশ বেশি ও শহরে যথাক্রমে ১০ ও ৫ শতাংশ বেশি, এবং যে সমস্ত জাত/বর্গ-র মেয়েদের কাজে যোগ দেওয়ার হার রাজ্যগত গড়ের অন্ততঃ পঁচিশ শতাংশ বেশি। দুই) শিক্ষাগত — যে সমস্ত জাত/বর্গ-র ৫–১৫ বছর বয়সী

শিশুদের কখনও স্কুলে না যাওয়ার হার ও স্কুল-ছুট এর হার রাজ্যগত গড়ের অন্ততঃ ২৫ শতাংশ বেশি, এবং সামগ্রিক মাধ্যমিক পাশের হার রাজ্যগত গড়ের অন্ততঃ ২৫ শতাংশ কম। তিন) অর্থনৈতিক — যে সমস্ত জাত/বর্গ-র পারিবারিক সম্পত্তির পরিমাণ রাজ্যগত গড়ের অন্ততঃ ২৫ শতাংশ কম, কাঁচা বাড়িতে থাকার হার ও ধারবাকি-র পরিমাণ রাজ্যগত গড়ের অন্ততঃ ২৫ শতাংশ বেশি, এবং যে সমস্ত জাত/বর্গের অন্ততঃ অর্ধেকের বাড়ি থেকে পাণীয় জলের উৎসের দূরত্ব আধ কিমির বেশি। এই মাপকাঠিগুলির গুরত্ব (ইংরেজিতে ওয়েট) আলাদা আলাদা — সামাজিক মাপকাঠিগুলির গুরুত্ব তিনগুণ, শিক্ষাগত মাপকাঠিগুলির গুরুত্ব দুই গুণ, এবং অর্থনৈতিক মাপকাঠিগুলির গুরুত্ব এক গুণ — এই ভাবে হিসেব করে তার যোগফল নিয়ে পশ্চাদপদতার মূল সূচক তৈরি করা হয়। প্রতিটি মাপকাঠির পিছিয়ে-থাকার মান এক (এবং এগিয়ে থাকার মান শূণ্য) ধরে নিয়ে; এগারোটি মাপকাঠির প্রথম চারটি-তে (সামাজিক) তিনগুণ করে, দ্বিতীয় তিনটি-তে (শিক্ষাগত) দুইগুণ করে এবং তৃতীয় চারটি-তে (অর্থনৈতিক) একগুণ করে গুরুত্ব ধরার ফলে পশ্চাদপদতার সূচকটির মোট মান দাঁড়ায় বাইশ। যে সমস্ত জাত/বর্গ গুলির মোট পশ্চাদপদতার মান বাইশের মধ্যে এগারো বা তার বেশি সেগুলিকে পশ্চাদপদ ও বাকিদের এগিয়ে থাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

আমরা এই পুস্তিকায় পরিচয়ভিত্তিক পশ্চাদপদতার বা অসমতার একটি সূচক তৈরির চেষ্টা করব। সেই সূচক-এর আলোচনায় আসার আগে আমরা মাপকাঠিগুলি সম্পর্কে বিশদ ও স্বচ্ছ ধারনা তৈরি করতে চাইছি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, ২০১৯ সালে প্রকাশ পাওয়া সমতার ইস্তাহার-এ অসমতার কয়েকটি মাপকাঠি দেওয়া হয়েছিল, যেমন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কাজ-বিত্ত-ব্যবসা-সুপরিবেশ-অবকাশ-ভ্রমণ। আমরা এখানে তিনটি মূল সূচক-এ সমস্ত মাপকাঠিকে ভাগ করছি।

ক) উন্নয়ন — উন্নয়নের মধ্যে পড়বে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজ, রোজগার, ব্যবসা, সুপরিবেশ ইত্যাদি মাপকাঠিগুলি।

খ) নিরাপত্তা — নিরাপত্তা নামক সূচকটির মধ্যে পড়তে পারে এমন অনেক কিছু মাপকাঠি যা আমরা আগে আলোচনা করিনি। কোনও একটা পরিচয়ের মানুষের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধ, তাদের জেল-এ থাকা বা রাষ্ট্রীয় শাস্তি-র আওতায় আসা, অস্বাভাবিক মৃত্যু, সাময়িক বা দীর্ঘমেয়াদীভাবে উদ্বাস্তু হওয়া, লকডাউন প্রভৃতি কারণে স্বাভাবিক

জনজীবন ব্যাহত হওয়া ইত্যাদি মাপকাঠিগুলি এর মধ্যে আসবে।

গ) স্বাধীনতা — এই সূচকটি বহু বিস্তৃত। অবকাশ, ভ্রমণ, খেলাধূলায় অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে বিবাহের বয়সের প্রসার, একত্রবাসের প্রসার, নাস্তিকতায় প্রসার, প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় ধর্ম পরিবর্তনের বিস্তার, ধর্মীয় বৈচিত্র্য, ব্যক্তির সারা জীবনে একাধিক ধরনের পেশায় সংযুক্তি — ইত্যাদি নানা মাপকাঠি আসতে পারে এই সূচকটির মধ্যে।

সমতার সূচক হিসেবে শুধু উন্নয়নের সূচক যথেষ্ট নয়। নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতার সূচকেরও প্রয়োজন আছে। কাশ্মীর মণিপুর মিজোরাম ইত্যাদি জায়গায় দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ ও মানুষের উদ্বাস্তু হওয়া, আবহাওয়া জনিত কারণে মানুষের বিপদ বেড়ে যাওয়া, এবং যৌনহিংসার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান লড়াই আন্দোলন আমাদের একটা নিরাপত্তার সূচক তৈরিতে বাধ্য করেছে। একইসাথে কমবয়সীদের বিশ্বাস সংস্কৃতি সম্পর্ক পেশা ইত্যাদির তরলতা আমাদের স্বাধীনতার একটি সূচক তৈরিতে উৎসাহ জুগিয়েছে।

উন্নয়নের সূচকের নানা মাপকাঠি আছে। আমরা প্রতিনিধিত্বমূলক চারটি মাপকাঠি নেব। শিক্ষার মাপকাঠি হল কলেজ (১০+২+৩) পাশ — অর্থাৎ, পনেরো বছর পূর্ণ সময়ের পড়াশুনা করেছে কত শতাংশ মানুষ। এই মাপকাঠিটি রাষ্ট্রপুঞ্জের উন্নয়ন সূচকের শিক্ষার মাপকাঠি-র থেকে নেওয়া। স্বাস্থ্য-র মাপকাঠি হল গড় আয়ু। এক্ষেত্রে আমরা পঞ্চাশ ও নব্বই-কে যথাক্রমে শূণ্য (সর্বনিম্ন) ও এক (সর্বোচ্চ) ধরে মাপকাঠিটা তৈরি করব। কাজের মাপকাঠি হবে পনেরো থেকে ষাট বছর বয়সের মধ্যে কতজন কাজ করতে চায় (যাকে পরিভাষায় বলে, লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন রেশিও), তা দিয়ে। এখানে আমরা তিরিশ থেকে সত্তর — এই দুই সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ মান নিয়ে মাপকাঠি বানাবো। প্রাপ্তবয়স্কদের বাৎসরিক গড় রোজগার উন্নয়নের শেষ মাপকাঠি। এক লক্ষ টাকা নিম্নতম, কুড়ি লক্ষ টাকা উচ্চতম। কিন্তু শুধু গড় রোজগার অনেক সময় ভুল সংকেত দেয়, যদি কিছু লোকের রোজগার অনেক বেশি হয় তাহলে গড় অনেক বেড়ে যায়। তাই আমরা এখানে আরেকটা অঙ্ক দিয়ে এই গড় রোজগার-কে ভাগ করব — তা হল, মান্য বিচ্যুতি বা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন। এই মান্য বিচ্যুতির ক্ষেত্রেও আমরা এক লক্ষ টাকা নিম্নতম ও কুড়ি লক্ষ টাকা উচ্চতম হিসেবে বিচার করব।

ভাগফল-কে আমরা বলব সুষম গড় রোজগার, এবং এই সুষম গড় রোজগারের এক নিম্নতম ও দশ উচ্চতম ধরে আমরা গড় রোজগারের মাপকাঠি বানাবো।

প্রতিটি মাপকাঠি শেষমেশ শূণ্য থেকে এক — এই স্কেল বা মাপক-এ নিয়ে আসা হবে।

নিরাপত্তার সূচকেরও নানা মাপকাঠি বানানো যায়। কিন্তু আমরা প্রতিনিধিত্বমূলক তিনটি মাপকাঠি নেব এক্ষেত্রে। প্রতি এক লক্ষ মানুষের মধ্যে কতজনের বিরুদ্ধে অপরাধ সংগঠিত হয় খাতায় কলমে, তা দিয়ে আমরা নিরাপদ মাপকাঠি তৈরি করব। এক্ষেত্রে এক লক্ষ জনে দশ জন হল সর্বোচ্চ, একশ' জন হল ন্যুনতম। কতজন জেল-এ আছে সেটা হবে আমাদের নিরপরাধ মাপকাঠি। এক্ষেত্রেও এক লক্ষ জনে দশ জন হল সর্বোচ্চ, একশ' জন হল সর্বনিম্ন। এই সূচকটির মাধ্যমে আমরা অপরাধীকরণের হার মাপছি। স্বাভাবিক মৃত্যু মাপকাঠিতে আমরা অস্বাভাবিক মৃত্যু সংখ্যা মাপব, সর্বোচ্চ হল এক লক্ষ জন-এ দশ, সর্বনিম্ন একশ'।

স্বাধীনতার সূচকেরও অনেক মাপকাঠি হতে পারে। প্রতিনিধিত্বমূলক হিসেবে আমরা সম্পর্ক-র স্বাধীনতা, অবিশ্বাসের বিস্তার এবং পেশাগত স্বাধীনতার তিনটি মাপকাঠি বানাবো। সম্পর্কের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আমরা প্রথম বিয়ের গড় বয়স নেব। এক্ষেত্রে আঠারো হল ন্যুনতম, আর তিরিশ হল সর্বোচ্চ। অবিশ্বাসের বিস্তারের ক্ষেত্রে আমরা ধরব মোট জনসংখ্যার দশ শতাংশ যদি অবিশ্বাসী হয়, তাহলে তা সর্বোচ্চ; এবং মোট জনসংখ্যার যদি এক শতাংশ অবিশ্বাসী হয়, তাহলে তা সর্বনিম্ন। স্বনিযুক্তি-র শতাংশ-কে আমরা পেশাগত ক্ষেত্রে স্বাধীনতার মাপকাঠি বলে ধরব। পনেরো থেকে ষাট বছর বয়সীদের মধ্যে কত শতাংশ স্বনিযুক্ত তার ভিত্তিতে তৈরি হবে এই মাপকাঠি, ন্যুনতম কুড়ি শতাংশ, সর্বোচ্চ আশি শতাংশ।

উন্নয়নের মতোই, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা সূচকের প্রতিটি মাপকাঠি শেষমেশ শূণ্য থেকে এক — এই স্কেল বা মাপক-এ নিয়ে আসা হবে। কোনও মাপকাঠির মান যদি শূণ্য থাকে, তাহলে পরবর্তীকালে বিপরীত গড়-এ জটিলতা এড়ানোর জন্য তাকে দশমিক শূণ্য শূণ্য এক জাতীয় কোনও সংখ্যা ধরে নেওয়া যেতে পারে।

আমরা সমতার সূচক তৈরি করব এই তিন সূচক-এ গুরুত্ব প্রদানের

মধ্যে দিয়ে। উন্নয়নের সূচক-এর তিন, নিরাপত্তার সূচকের দুই, এবং স্বাধীনতার সূচকের এক গুরুত্ব। এই হিসেব সবচেয়ে ভালো হয়, যদি তিনটি মূল সূচক-এই সমান সংখ্যক মাপকাঠি ব্যবহার হয়। যদিও আমাদের এখানে উন্নয়নের চারটি মাপকাঠি, এবং নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার তিনটি করে মাপকাঠি। আলাদা আলাদা সূচক-গুলির মাপকাঠি তৈরির জন্য সেগুলির মধ্যেকার মাপকাঠিগুলির মধ্যে বিপরীত গড় ব্যবহার করাই ভালো, যাতে ওই মূল মাপকাঠিটি তার মধ্যের মাপকাঠিগুলির ভেতর দু-একটা মাপকাঠির হাল ভালো হলেও সবচেয়ে খারাপ হাল যে মাপকাঠিটির, তার কাছাকাছি থাকতে পারে। এই তিন মূল সূচক গুরুত্ব সহযোগে একত্রিত করে যে সূচকটি তৈরি হবে, সেটিই সমতার সূচক। প্রতিটি পরিচয় (এবং একাধিক পরিচয়ের ইন্টারসেকশন বা প্রতিচ্ছেদ) এর এই সমতার সূচকে একটি মান থাকবে, এবং সেই মানের তফাত দিয়ে চিহ্নিত হবে কোন পরিচয়টি কোন পরিচয় থেকে কতটা পিছিয়ে বা এগিয়ে।

বলাই বাহুল্য, মন্ডল কমিশনের মতো এখানে কিছু পরিচয়-কে পরম ভাবে এগিয়ে বা পিছিয়ে হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে না। বরং পরিচয়গুলি একে অন্যের চেয়ে কতটা এগিয়ে বা পিছিয়ে — এই আপেক্ষিক মাপ আমাদের সমতার সূচক থেকে পাওয়া যাবে। এই আপেক্ষিকতার জন্যই সমাজের সার্বিক প্রগতিতে সমতা একটি ইঞ্জিনের মতো কাজ করবে। পরিচয়ভিত্তিক আন্দোলনে প্রিভিলেজ বা সুবিধাভোগী শব্দটা ব্যবহার হয় আকছাড়। সমতার সূচকের মধ্যে দিয়ে তার বাস্তব পরিমাপ সম্ভব। পরিচয়ভিত্তিক আন্দোলনের ন্যায্যতা নির্ণয়েও এই সমতার সূচক কাজ করবে — যে পরিচয় সমতার সূচকের নিচের সারিতে, তার আন্দোলনগুলি ন্যায্য; অপরপক্ষে যে পরিচয়গুলি সমতার সূচকে ওপরের দিকে, সেইসব পরিচয়ভিত্তিক আন্দোলন অন্যায্য। আপেক্ষিক অসমতার ভিত্তিতে সমতার আন্দোলন নিজেই বিকশিত হতে পারে, ন্যায্য পরিচয়-ভিত্তিক আন্দোলনগুলিকে সঙ্গে নিয়ে। এবং তা রাষ্ট্রীয় বা ওপর থেকে বলে দেওয়া কোনও একটা মান্য স্তরে উত্তরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং সমতার আন্দোলন একটি বহমান আন্দোলন-এ পরিণত হয়।

ব্যক্তিভিত্তিক সমতা নয়, পরিচয়ভিত্তিক সমতা

এগিয়ে বা পিছিয়ে থাকার পরিচয়ভিত্তিক পরিমাপ নিয়ে একটা অস্পষ্টতা স্বাধীন ভারতে সবসময়ই নানা মহলে দেখা গেছে। আগে তা অনেক বেশি ছিল। যেমন, কাকা কালেলকর কমিশন-এর সদস্যদের মধ্যে একজন বাদে বাকি সবাই পশ্চাদপদতার জাতভিত্তিক পরিমাপে আপত্তি জানিয়েছিল। সার্বিক প্রগতির জন্য কাকা কালেলকর কমিশন ভূমি সংস্কার ইত্যাদির কথা বলেছিল, পশ্চাদপদ বর্গের জন্য সরকারি চাকরিতে ২৫-৪০ শতাংশ সংরক্ষণ এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষায় সত্তর শতাংশ সংরক্ষণের পাশাপাশি। মন্ডল কমিশন নিজের সমীক্ষায় দেখিয়েছিল, অন্ততঃ ২২ শতাংশ সাধারণ মানুষ জাতভিত্তিক পশ্চাদপদতার পরিমাপের পক্ষে নয়। ১৯৮০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি কমিটি তৈরি করে — সংবিধানের সমানতার ধারাগুলি অনুযায়ী কি রাজ্য সরকারের অন্যান্য পিছিয়ে পড়া বর্গ চিহ্নিত করে তাদের জন্য সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা উচিত — তা পর্যালোচনা করার জন্য। সেই কমিটি রিপোর্ট দেয়, "দারিদ্র্য এবং জীবনযাপনের নিচু মান হল পিছিয়ে থাকার মাপকাঠি, জাতের বদলে"। পিছিয়ে থাকার পরিচয়-ভিত্তি বলতে এই কমিটি রায় দেয় — তা হল পেশাগত গোষ্ঠী (শ্রমিক, কৃষক, কুমোর, কামার ইত্যাদি)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই রিপোর্ট মেনে নেয়।

দারিদ্র্য, জীবনযাত্রার মান — এগুলি কোনওটাই মানব-বর্গ নয় — কিছু মাপকাঠি। অন্যদিকে জাত হল মানব-বর্গ, নিজে কোনও মাপকাঠি নয়। আমরা যেন পরিচয় এবং মাপকাঠি — এই দুটিকে পরস্পরের সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলি। সাধারণতঃ বামপন্থী ও সমাজবাদীদের একাংশের মধ্যে মাপকাঠিগুলিকে মানব-বর্গ হিসেবে (গরীব মানুষ, পিছিয়ে পড়া মানুষ, নিচু তলার মানুষ ইত্যাদি) বলার ভ্রান্ত প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অপরপক্ষে জাতভিত্তিক রাজনীতির অনেক দলের মধ্যেই জাত নিজেই

পিছিয়ে থাকার মাপকাঠি বলে দাবি করার প্রবণতাও মারাত্মকভাবে লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি তপশিলী জাতগুলির মোট সংরক্ষণের মধ্যেও জাতভিত্তিক অন্তঃসংরক্ষণের পক্ষে রায় দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট; কারণ তথ্য দেখায়, তপশিলী জাতের সংরক্ষণের সুফল অনেক ক্ষেত্রে ভোগ করে শুধুমাত্র সেই সব তপশিলী জাতের মানুষ যারা তুলনায় কিছুটা এগিয়ে থাকা। এই রায়ের বিরোধিতায় এরা বলেছিল — তপশিলী জাত পরিচয় নিজেই একটি পশ্চাদপদতা, ফলে তাদের মধ্যে এগিয়ে থাকা বা পিছিয়ে থাকার ভিত্তিতে অন্তঃসংরক্ষণের প্রয়োজন নেই।

পরিচয়ভিত্তিক সমতায় আমরা কোনও পরিচয় বা পরিচয়ের অক্ষ-কেই (যেমন জাত, ধর্ম, লিঙ্গ, পেশা ইত্যাদি) আলাদা গুরুত্ব দিতে নারাজ। তেমনি কোনও পরিচয়কেই আমরা ভিত্তি হিসেবে অস্বীকার করতেও রাজি নই। জন্মগত হোক বা জীবৎকালে অর্জিত, আমাদের কাছে যে কোনও পরিচয়ভিত্তিক অসমতার মাপ-ই সমান প্রাসঙ্গিক।

সমতার পরিমাপ হল একটি অনুপাত, ওপরে মাপকাঠি এবং নিচে পরিচয় — পরিচয়ভিত্তিক মাপকাঠি।

সমতা কখনওই ব্যক্তিভিত্তিক নয়। অর্থাৎ, সমতার সূচক কখনওই কোনও ব্যক্তির এগিয়ে থাকা বা পিছিয়ে থাকার সূচক নয়। সে যে পরিচয় বহন করে তার এগিয়ে থাকা বা পিছিয়ে থাকার সূচক। এবং সেই সূচকও গড় মাত্র। অর্থাৎ, ওই পরিচয় বহন করা কোনও ব্যক্তি ব্যতিক্রম হতেই পারে। রোহিত ভেমুলা তার শেষ চিঠিতে মানুষকে পরিচয়ের সংকীর্ণতায় দেখার বিরোধিতা করে বলেছিলেন, ব্যক্তি মানুষ ব্রহ্মাণ্ডের ধূলিকণা দিয়ে গঠিত, তার আশু পরিচয়ের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে তাকে ধরা যায় না। ফলে ব্যক্তি যেমন তার পরিচয় বহন করে, আবার সে সেই পরিচয়ের ঊর্ধ্বেও।

সমতার ইস্তাহার (আপডেটেড)

১) বর্তমান ভারতে সমতা নেই। জাত-ধর্ম-লিঙ্গ-জাতিসত্ত্বা-ভৌগলিক অবস্থান ইত্যাদি ভেদ-এ কারোর বেশি সম্পদ তো কারোর কম। কারোর শিক্ষার হার বেশি তো কারোর কম। কারোর চাকরি বেশি, ব্যবসা বেশি; কারো কম। কারো স্বাস্থ্য ভালো, কারো মন্দ। কেউ সামাজিকভাবে বেশি নিরাপদ, তো কেউ কম। ফলতঃ আমরা সমতার ইস্তাহার তৈরিতে বাধ্য হচ্ছি। এই ইস্তাহারের উদ্দেশ্য অসমতা দূর করা।

২) ভেদাভেদ নানা প্রকার। ভেদাভেদ বরাবর বিদ্বেষও আছে ষোলো আনা। তাই ভেদাভেদগুলি এড়িয়ে যাওয়া ঠিক না। আমরা মনে করি, ভেদাভেদগুলি একে অন্যের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান নিয়ে তখনই চলতে পারবে, যখন অসমতা ঘুঁচে গিয়ে সমতা আসবে। নচেৎ পারস্পরিক হিংসা ও বিদ্বেষ অনিবার্য, তাই সমতার ইস্তাহার এই পারস্পরিক বিদ্বেষ কাটানোরও একটা উপায়।

৩) ধর্মের দিক দিয়ে ভারতের প্রবল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিজেদের হিন্দু বলে পরিচয় দেয় এবং দেখা যায়, শিক্ষা স্বাস্থ্য সব দিক দিয়েই হিন্দুরা এগিয়ে মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায়। মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সমতার সূচকে হিন্দুদের সমপর্যায়ে আনার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা (সংরক্ষণ, ইনসেনটিভ ইত্যাদি) নিতে হবে। মুসলিমদের মধ্যে বেশি অপরাধের হার কমাতেও সাহায্য করবে এই ব্যবস্থা।

৪) লিঙ্গের দিক দিয়ে পুরুষ ও মহিলার (এবং অন্যান্য লিঙ্গের) ফারাক উল্লেখযোগ্য। সেই ফারাক ঘোচাতে হবে — উন্নয়ন, নিরাপত্তা, স্বাধীনতা — সর্বত্র। এবং তার জন্য মেয়েদের দিকে টেনে নানা ব্যবস্থা (সংরক্ষণ, ইনসেনটিভ ইত্যাদি) করতে হবে।

৫) জাতের দিক দিয়ে এসসি এসটি ওবিসি রিজার্ভেশন আছে, কিন্তু এগুলি অফিশিয়াল নাম। আসল জাত হল রাজবংশী, সাঁওতাল, কায়স্থ

ইত্যাদি। জাতকে তার নিজস্ব নাম হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং অসমতার নিরিখে বিচার করে সংখ্যাগত অনুপাতে সুবিধার (সংরক্ষণ, ইনসেনটিভ ইত্যাদি) বন্দোবস্ত করতে হবে শিক্ষা, চাকরি, রাজনীতি সহ সর্বত্র। এর জন্য দশমবর্ষীয় জনগণনায় আবশ্যিকভাবে জাতভিত্তিক সামাজিক-অর্থনৈতিক গণনাও করতে হবে।

৬) ফেডারেলিজমকে উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার নিরিখে পুনঃসংজ্ঞায়ন করতে হবে। একটি রাজ্য যদি অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় সমতার সূচকে পিছিয়ে থাকে অনেকটা, তাহলে সেই রাজ্য দুর্বল হতে বাধ্য। ফেডারেলিজম-এর পূর্বশর্ত রাজ্যগুলির মধ্যে সার্বিক সমতা।

৭) শিক্ষা, যোগাযোগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ভাষার ভূমিকা নির্ধারক। ফলতঃ উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার নিরিখগুলিতে ভাষাভিত্তিক অসমতা বা বৈষম্য দূরীকরণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৮) সমস্ত সামগ্রিক স্বার্থের উদ্যোগে — যেমন পরিবেশ, বিনোদন, ত্রাণকার্য, উৎসব ইত্যাদিতে সরকার ও মানুষের সংগঠনগুলি কাজ করে। এই সমস্ত কাজ এবং উদ্যোগে জাত-লিঙ্গ-ধর্ম-ভাষা-জাতি ইত্যাদি ভিত্তিক সমতামূলক অংশগ্রহণ চাই। এগুলির সুফল ভোগও সমতামূলক হতে হবে।

৯) সম্পদের অসম বন্টন এবং তার বাড়বৃদ্ধি আমাদের দেশের এক সমস্যা; হয়ত গোটা পৃথিবীরই। পুঁজিবাদের কারণে তা বেড়েই চলেছে, অর্থনীতিবিদরা তাই দেখাচ্ছেন। সেই সমস্যার নিরসনে এখানেও সমতার আদর্শের প্রয়োজন। বড়লোক-দের কাছ থেকে সরাসরি টাকা/সম্পদ নিয়ে গরীবদের মধ্যে বন্টন করতে হবে। এবং এই পুনর্বন্টন চলতেই থাকবে, যতদিন বিত্তবন্টনে অসমতা থাকবে।

১০) চাকরির বেতনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বেতন এবং সর্বনিম্ন বেতনের মধ্যে তফাত বড্ড বেশি। এক্ষেত্রেও সমতা চাই। দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষে বেতনের কমবেশি হতে পারে, কিন্তু সর্বোচ্চ বেতন কখনো সর্বনিম্ন বেতনের তিন-চার গুণের বেশি হওয়া চলবে না।

১১) এই ইস্তাহারে উন্নয়নের সূচক বলতে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজ, রোজগার ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। নিরাপত্তার সূচক বলতে হিংসা এবং রাষ্ট্রীয় শাস্তির শিকার হওয়া, অস্বাভাবিক মৃত্যু ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। স্বাধীনতার সূচক বলতে বিশ্বাস, সম্পর্ক ও পেশাগত স্বাধীনতা ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে।

জানুয়ারি ২০২৫

বিনিময় ১৫/-

Equity Manifesto

Equity before equality. Equality exists among the equals. Equating unequals is perpetuating inequality.

Links / Contacts

fb.me/EquityManifesto

t.me/equfesto

Shamik	9674486426
Bankim	8902638794
Souvik	9474717627
Sreedip	8240806448
Sambuddha	8420503422
Priyanka	7031202495

শমীক সরকার (কল-৩১)
কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রিন্টিং
আর্ট পটুয়াটোলা লেন
থেকে মুদ্রিত